গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ধর্মভিত্তিক জনগণনার রিপোর্ট

শাসকদলগুলোর হীন চরিত্রই উন্মোচিত হল

ভারত সরকারের জনগণনা রিপোর্টের ধর্মভিত্তিক তুলনামূলক প্রাথমিক বিশ্লেষণে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়া এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা কমে যাওয়ার সংবাদ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু পরদিনই প্রকাশিত হয়েছে জনগণনার ওই বিশ্লেষণ ঠিক নয়। কারণ, '৯১ সালের জনগণনায় মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীর বাদ থাকায় এবং ২০০১ সালে কাশ্মীরকে যুক্ত করে জনগণনা হওয়ায় তুলনামূলক বিচারটা সমান সমান হয়নি। বরং ২০০১ সালের হিসাব থেকে কাশ্মীরকে বাদ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়েনি, বরং তা ৩২.৮ শতাংশ (১৯৯১) থেকে কমে ২৯.৩ শতাংশ (২০০১) হয়েছে।

আমাদের দেশের মতো বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু জাতি অধ্যুষিত দেশে জনগণনার ধর্মীয়, ভাষিক বা জাতিগত বিশ্লেষণ করা এবং তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে কোন সরকারেরই উচিত অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে তা যাচাই করা এবং কেন কী উদ্দেশ্যে তা প্রকাশ করা হচ্ছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জনগণকে বলা। না হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় শাসকদল বা শাসনক্ষমতার বাইরের সাম্প্রদায়িক দল বা সংগঠন ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে যেভাবে কাজে লাগিয়ে কখনো প্রকাশ্যে কখনো চোরাপথে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, তাতে এধরনের ধর্মভিত্তিক পরিসংখ্যান যেকোন মুহূর্তে উত্তেজনার শুকনো বারুদে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

আগের বিজেপি সরকারের নির্দেশে তৈরি করা ধর্মভিত্তিক জনগণনার হিসাব এখন কেন্দ্রের কংগ্রেস জোট সরকারের উচ্চ মহলের সম্মতি ছাড়া প্রকাশিত হতে পারে না এবং ঘটনা হল বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই তা ঘোষণা করা হয়েছে। লক্ষণীয় এই পরিসংখ্যান প্রকাশের সাথে সাথে বিজেপি প্রবল

পাঁচের পাতায় দেখুন

সতর্কবার্তা ছাড়াই বাঁধ থেকে জল ছাড়ার প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, "আগাম সতর্কবার্তা না জানিয়ে জলাধার থেকে জল ছাড়ায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, বীরভূম ও বর্ধমানের কয়েক লক্ষ মানুষ বন্যার প্লাবনে চরম দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছেন। সরকার থেকে রিলিফের ব্যবস্থা নামমাত্র। আমরা সরকারের এই ঔদাসীন্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং বন্যাদুর্গতদের জন্য পর্যাপ্ত রিলিফের ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ ও পূর্ণ পুনর্বাসনের দাবি জানাচ্ছি।"

বন্ধ্যা বীজে বিপন্ন চাষীদের আন্দোলন

গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি, দেশি ও বিদেশি বহুজাতিক বীজকোম্পানিগুলির সরবরাহ করা উচ্চফলনশীল বীজের নামে বন্ধ্যা বীজের শিকার হয়ে চাষীরা ক্রমাগত সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। কোচবিহার ও বাঁকুড়ার গমচাষী, বর্ধমানের আলুচাষী, মেদিনীপুরের সূর্যমুখী ও বাদামচাষীর ফসলে আগুন লাগানো ও আত্মহত্যার পর এবার বাদুড়িয়ার ফুলকপি চাষীদের পালা। বন্ধ্যা ফুলকপি বীজে আক্রান্ত হয়ে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ড ও বসিরহাট ২নং ব্লকের কিছু অংশের ব্যাপক সংখ্যক চাষী আজ সর্বস্বান্ত। এই এলাকার চাষীরা গত কয়েক বছর ধরে এই জলদি ফুলকপির চাষ করছেন। কয়েক বছর ধরে চাষ করার সুবাদে এই চাষে তারা অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। কিন্তু এ বছর চাষের কোনও অভিজ্ঞতাই তাঁদের বাঁচাতে পারেনি। কারণ কপির বীজ এবার বন্ধ্যা। বহুজাতিক কোম্পানির সরবরাহ করা ১০ গ্রাম করে বীজভর্তি প্যাকেটের কোনটিতে White Shot, ORIGIN-USA; আবার কোনটিতে Golden Seeds Pvt. Ltd, Bangalore-560082 (INDIA) লেখা। এই প্যাকেটে এবারের বীজ বন্ধ্যা। এই কারণে চাষীদের তত্ত্বাবধানে গাছ হয়েছে কিন্তু ফল হয়নি।

চাষীরা এই বীজ কিনেছেন স্থানীয় খোলাপোতা বাজারের কে সি খাঁড়ার বীজের দোকান থেকে। এই এলাকার প্রায় দুই শত চাষী আনুমানিক ৫০০ বিঘার মতো ফুলকপি চাষ করেছেন। এই চাষ খুব ব্যয়বহুল। বিঘা প্রতি খরচ কমপক্ষে ২৫,০০০ টাকা। ফলে সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ মোট দু'কোটি টাকা। চাষীদের জিজ্ঞাসাবাদ

পাঁচের পাতায় দেখুন

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, ডি পি ই পি বাতিল প্রভৃতি দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও ওড়িশা রাজ্য কমিটির ডাকে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে ভুবনেশ্বরের উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভ। জাজপুর, খুরদা, রাউরকেলা, ভোগরি, যোশিপুর, ভদ্রক সহ অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষোভ অবস্থান হয়।

এবার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিচ্ছে সরকার

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার চতুর্থশ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে অবাধ প্রমোশন নীতি চালু করেছিল। এবার তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে। এ ব্যাপারে রাজ্যের শিক্ষক ও শিক্ষামহলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই শিক্ষক ও শিক্ষামহলের প্রতিনিধিরা অন্তত অধিকাংশই যে সিপিএম-এর অনুগত হবেন, অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো থেকে একথা স্পষ্টই বলা চলে। অথচ প্রধানত শাসকদলের ধামাধরা শিক্ষকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করে যে সরকারি সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছে বলাবাহুল্য সরকার একেই প্রচার করবে জনগণের রায় হিসাবে — জনগণের মতামত নিয়েই পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া হচ্ছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে ঢালাও পাশ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যাতে কার্যকরী করা যায় সেই লক্ষ্যে প্রশাসনিক মহলে জোর তৎপরতাও শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই পাশফেল নির্বাসন কমিটিতে রয়েছেন রাজ্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, রবীন্দ্র মুক্তবিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা সংসদের সভাপতিগণ। বামফ্রন্ট সরকার অবশ্য বলেছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংস্থা এন সি ই আর টি'র সুপারিশ সামনে রেখে তারা এ ব্যাপারে এগোচ্ছেন। সরকারের এই কথাটা লোকঠকানো। কারণ, এন সি ই আর টি'র সুপারিশ মানার বাধ্যবাধকতা থাকুক আর নাই থাকুক পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার নীতি বামফ্রন্টেরই গৃহীত নীতি। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এই নীতি কার্যকরী করে ইতিমধ্যেই শিক্ষার চরম সর্বনাশ তারা ঘটিয়েছে। শিক্ষা নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁরা এই সর্বনাশের চিত্র দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কারণ কী, তা আজও সরকার জনগণের জ্ঞাতার্থে বলেনি। তবে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সময় তারা বলেছিল, এর ফলে ড্রপ আউটের (স্কুল ছুট) সংখ্যা কমবে। তাদের যুক্তি ছিল, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে ভয় পায় এবং সেই কারণে অনেকেই পড়া ছেড়ে দেয়। তারা এও বলেছিল যে, পরীক্ষার চাপ কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে। তাদের এই যুক্তিগুলি যে নেহাৎই কুযুক্তি এবং বাস্তবের সঙ্গে মেলে না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল গ্রামবাংলা থেকে শুরু করে শহরাঞ্চল সর্বত্রই বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভব — যেখানে নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া হয়, অন্যদিকে পরীক্ষাব্যবস্থাহীন বিরাট সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি। পরীক্ষা দিতে ছাত্ররা ভয় পেলে বেসরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ত না। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত চতুর্থ শ্রেণীর বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় ক্রমবর্ধমান হারে ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ বামফ্রন্টের কুযুক্তিকে পুরোপুরি নস্যাৎ করেছে। বাস্তবিকপক্ষে অভিভাবকরা যেদিন অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করলেন যে, প্রাথমিকে পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে মূল্যায়নের নামে যা চলছে তাতে সন্তানদের লেখাপড়ার কোন তাগিদই থাকছেনা, তারা এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে বোঝারই উপায় নেই, সেদিন থেকে তাঁরা সরকারি বিদ্যালয় পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেশের বিরাট সংখ্যক

চারের পাতায় দেখুন

উত্তর ২৪ পরগণা

ভাটপাড়ায় জলকর বিরোধী আন্দোলন

উত্তর ২৪ পরগণার ভাটপাড়া পৌরসভার জলকর বসানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ভাটপাড়া নাগরিক কমিটি, বৃহত্তর শ্যামনগর জলকর প্রতিরোধ কমিটি ও নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে নাগরিক আন্দোলন চলছে। যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি স্বরূপ নাগরিকেরা জলকর বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে পৌরসভা জলের লাইন কাটার হুমকি দেয়। এরই প্রতিবাদে আন্দোলনরত তিন কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর পৌরসভার সামনে গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রবল বর্ষণকে উপেক্ষা করে কয়েকশো নাগরিক অবস্থানে সামিল হন। অবস্থান থেকে নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের এক প্রতিনিধি দল চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি নাগরিকদের দাবি বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন। জলকর প্রত্যাহার না করা হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আইন অমান্য

৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যব্যাপী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আইন অমান্য কর্মসূচি পালিত হয় জলপাইগুড়িতেও। অ্যাবেকার নেতৃত্বে শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক জেলা শাসকের দপ্তরে আইন ভেঙে কারারুদ্ধ হন। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে সংগঠিত এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বীরেন তালুকদার, অ্যাডভোকেট দ্রুতি রায়, অধ্যাপক মনোতোষ প্রামাণিক, অমল রায়, নারায়ণ সাহা প্রমুখ।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর সদর হাসপাতালের সংস্কার দাবি

বহরমপুরের নিউ জেনারেল হাসপাতাল এবং সদর হাসপাতালকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, সদর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক পুনরায় চালু করা, টিবি ওয়ার্ডের সংস্কার, জেলার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্থায়ী ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর সিএমওএইচ দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন পরিচালিত হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পূর্ণিমা কর্মকার, ডাঃ রবিউল আলম, সামসুল আলম, ডাঃ এম এ সবুর, বেবি বাগচি প্রমুখ। সমগ্র কর্মসূচি পরিচালনা করেন কমিটির জেলা সম্পাদিকা প্রতিমা সিরাজ।

বর্ধমান

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ঋণগ্রহীতাদের কর্মশালা

সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন শতাধিক ঋণগ্রহীতার উপস্থিতিতে গত ৫ সেপ্টেম্বর সারাদিনব্যাপী এক কর্মশালা বর্ধমান সি এস এস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে কর্মশালার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি স্বপন ব্যানার্জী। প্রত্যেকটি ব্লক থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাদের সমস্যাগুলো প্রশ্নাকারে রাখেন। সমস্যাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঋণগ্রহীতাদের উপর পুলিশি ও প্রশাসনিক হয়রানি, কোর্ট কেস ও সার্টিফিকেট কেস, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নোটিশ, রিকভারি ক্যাম্পের নামে কম্প্রোমাইজ সেটেলমেন্ট, ব্রিটিশ আমলের কালা কানুন পিডিআর অ্যাক্ট প্রয়োগ, পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটির নানান চাপ ও হয়রানি।

সমস্ত প্রশ্নগুলোর উপর সুচিন্তিত ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কর্মশালার উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলেন সমিতির রাজ্য সভাপতি প্রবীর মাহাতো ও রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস। সমিতির দীর্ঘ দিনের অপূরিত দাবিগুলি আদায়ের উদ্দেশ্যে জেলার সর্বত্র তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান বর্ধমান জেলা সম্পাদক তপন চক্রবর্তী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জয়ন্ত ব্যানার্জী, ইন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রমুখ। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন জেলা সভাপতি মহঃ জাকারিয়া। ২২ সেপ্টেম্বর ডি এমের নিকট ডেপুটেশনের কর্মসূচি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

৯ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আইন অমান্য

অধিগ্রহণ করে বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবি জানাল শ্রমিকরা

গত ৩১ আগস্ট '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদ দিবসে নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ দপ্তরের সামনে অবিলম্বে সমস্ত বন্ধ চা-বাগানের লীজ বাতিল করে সরকারি অধিগ্রহণের মাধ্যমে চালু করার দাবিতে শতাধিক চা-শ্রমিকের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। ঐ কর্মসূচিতে ঘোষণা করা হয় যে, ৬ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিতে ১ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর গণডেপুটেশনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হবে। ঐ দিন কলকাতায় রানি রাসমণি রোডে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।

আজকের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বন্ধ চা-বাগান রায়পুর, ডেংগুয়াঝাড়, শ্রীদুর্গা টি প্ল্যানটেশন (গ্যাংটক), লেবুডাঙ্গা টি প্ল্যানটেশন, টুলিফ অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট (কামারপাড়া), মা কালী অ্যাগ্রো টি প্ল্যানটেশন, বানিয়াপাড়া ভুষাপাড়া টি এস্টেট, এস সি দাস অ্যাগ্রো টি প্ল্যানটেশন, সুখানী টি এস্টেট ছাড়াও অন্যান্য চা-বাগান থেকে শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন।

এই সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা চা-শ্রমিকদের উপর মালিকের এই নির্মম অত্যাচারের মুহূর্তে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত মালিক তোষণকারী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন। সাথে সাথে চা-শিল্পে সিটু, আই এন টি ইউ সি এবং আর এস পি অনুমোদিত ইউনিয়নেরও সমালোচনা করে বিভিন্ন বক্তা বলেন যে, এই সমস্ত ইউনিয়নগুলি চা-শ্রমিকদের ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে না ফলে মালিকরা বেপরোয়া আক্রমণ চালাচ্ছে। চা শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতা কমরেডস্ শঙ্কর গাঙ্গুলী, সুব্রত দত্তগুপ্ত, দেবাশীষ সাহা, রবি রায়, শরৎ দাস, উমা রায়। উক্ত অবস্থানে এন বি টি পি ই ইউ -এর সহসম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া

মহামিছিলের দেওয়াল লিখনরত এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর আর পি এফ-এর হামলা

৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা নাগাদ এস ইউ সি আই কর্মীরা যখন হাওড়া স্টেশনের রেললাইনের ধারে মহামিছিলের দেওয়াল লিখন করছিল, তখন হঠাৎ আর পি এফ-এর লোকজনেরা তাদের উপর চড়াও হয়। তারা এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড শুকদেব বারিক, তাপস বেরা, নির্মল সামন্ত, জয়ন্ত খাটুয়া, পদ্মলোচন সাউ, অমর সিং ও স্বপন সাহাকে গ্রেপ্তার করে লক্-আপে ঢুকিয়ে দেয় এবং প্রায় দেড় ঘন্টা আটকে রাখে। এমনকী বলা হয় — 'তোমরা এস ইউ সি আই কর্মী কিনা জানব কী করে? তোমরা যে RDX ফিট করতে আসনি — তার প্রমাণ কী?'' আমাদের কর্মীরা যখন বলে যে অন্যদলও তো ওই জায়গায় লিখেছে, তাহলে আমাদের লিখতে দিতে অসুবিধা কোথায়? তখন ডিউটিরত আর পি এফ অফিসার হুমকি দিয়ে বলেন — ''বেশি কথা বললে কোর্টে চালান করে দেব।'' শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মীদের দিয়ে জোর জবরদস্তি দেওয়াল লেখা মোছানো হয়, তারপর তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। প্রশ্ন হল, বামপন্থী গণআন্দোলনের কর্মীদের এভাবে হেনস্থা ও হয়রানি করার সাহস রেলপুলিশ পাচ্ছে কোথা থেকে? এস ইউ সি আই হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে রাজনৈতিক প্রচারে এভাবে পুলিশি হামলা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর

কর্মীরা ২৫ বছর অস্থায়ী ঃ ভাতা মাসে ১০০ টাকা

ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিউনিটি হেল্‌থ গাইড ইউনিয়নের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৭ সেপ্টেম্বর দেড়শতাধিক সিএইচজি এবং টিডি কর্মী তাদের উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অবিচার ও বঞ্চনার প্রতিবাদে ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে বালুরঘাটে জেলা সভাধিপতি ও সিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিএইচজি ও টিডি কর্মীরা দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে মাসে মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে কাজ করে আসছেন এবং আজও তাদের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়নি।

পুরুলিয়া

পরিচারিকাদের ডেপুটেশন

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি পুরুলিয়া শহর শাখার উদ্যোগে পরিচারিকাদের নাম বিপিএল তালিকায় নথিভুক্ত করা, হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা, সন্তানদের সর্বস্তরে বিনাপয়সায় পড়াশুনার ব্যবস্থা করা ও পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে গত ৮ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যানের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন — সুলেখা বাউরী, রেখা বাউরী, কাজল মাহাত ও শোভা মাহাত। দাবি পূরণ না হলে তাঁরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কলকাতা

পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু

১ সেপ্টেম্বর ঢাকুরিয়ার সেলিমপুরের বাসিন্দা শিপ্রা দাসের বাড়িতে কর্মরতা ১১ বছর বয়সের বালিকা পরিচারিকা ভগবতী হালদারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর কসবা থানায় এক বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রাধা মিত্র, অঞ্জলি দত্ত ও বিজলী ঘরামীর নেতৃত্বে এই ডেপুটেশনে প্রায় ৫০ জন স্থানীয় পরিচারিকা মা-বোন উপস্থিত ছিলেন। পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি কসবা থানার অফিসার ইনচার্জের হাতে দেওয়া হয়। থানা অফিসার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই ৬ অক্টোবর মহামিছিল

একদিকে পুঁজিপতিশ্রণীর শোষণ লুণ্ঠন, অন্যদিকে সরকার, পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির চাপানো ট্যাক্সের বোঝায় জেরবার সাধারণ জনজীবন। সাধারণ মানুষের কান্না-ঘাম-রক্ত নিংড়ে নিয়ে ভরে উঠছে, উপচে পড়ছে পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের মুনাফার ভাণ্ডার; মেটানো হচ্ছে নেতা-মন্ত্রী-পুলিশ-প্রশাসন-আমলাদের বেঁচে থাকার যাবতীয় স্ফূর্তি, আমোদ ও বিলাসিতার খরচ। আর এদেশের চাষী মজুর মধ্যবিত্ত — যারা সভ্যতার রথ টেনে নিয়ে চলে, উৎপন্ন করে সমাজের সমস্ত সম্পদ, বয়ে নিয়ে চলে দেশের সকল বোঝা, তাদের কপালে শুধু বঞ্চনা আর প্রতারণা! কংগ্রেস বিজেপি প্রভৃতি বুর্জোয়া দলের মতই সিপিএম নেতৃত্বও বামপন্থা ছেড়ে নিজেদের বেচে দিয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণীর পায়ে। এই অবস্থায় চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের বাঁচার দাবি নিয়ে আন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন করে চলেছে এস ইউ সি আই। সেই আন্দোলনের একটি ধাপ ৬ অক্টোবরের মহামিছিল। মানুষের বাঁচার দাবিতে লক্ষ মানুষের প্লাবনে রাজধানী কলকাতাকে প্লাবিত করবার ডাক দিয়েছেন সংগ্রামী নেতৃত্ব।

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সর্বত্রই নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ। গ্রামে চাষী ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। পুঁজিপতিরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, দাম ওঠায় নামায়। ঘাম রক্ত ঝরানো চাষীর উৎপন্ন ফসল থেকে তারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা কামাচ্ছে। চাষী মরে অনাহারে। আবার কৃষিসার ও ওষুধ চাষীকে কিনতে হয় চড়া দরে, মুনাফা লোটে ম্যাল্টিন্যাশনালরা। ঋণের জালে চাষী আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে। অনেকে জমি হারাচ্ছে। খাবে কী? বাঁচবে কী করে? গ্রামেও কাজ নেই। ছুটছে শহরে। শহরের ফুটপাত, রেল লাইনের দু'ধারের ঝুপড়ি এবং বস্তি এলাকাগুলোয় এদের ঠাঁই। রিক্সা ঠেলে, মোট বয়ে, 'বাবু'র বাড়ি ঝি-এর কাজ করে, হকারি করে ওরা কোনরকমে বাঁচবার চেষ্টা করে। তাতেও এদের রেহাই নেই। সরকার ও পুরসভা শহর পরিচ্ছন্ন করবার অছিলায়, রেলের জমি দখলমুক্ত করার বাহানায় সশস্ত্র পুলিশ আর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় এদের আস্তানা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বৃদ্ধ বাবা-মা নিয়ে ওরা দাঁড়ায় খোলা আকাশের নিচে — শীতে বর্ষায় রোদে।

সুন্দরবন সহ নদীবেষ্টিত গ্রাম বাংলার নদীতে নদীতে জাগছে চর। বিশাল তার আয়তন। কিন্তু ড্রেজার দিয়ে পলি সরানো এবং সঠিক খাতে জলস্রোতকে প্রবাহিত করানোর কোন উদ্যোগ কারো নেই। ফলে স্রোত ঘুরে আসছে, আঘাত হানছে ভূখণ্ডে। গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে। শস্যশ্যামল আবাদী জমি, ঘর বাড়ি স্কুল সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। মানুষ হচ্ছে পথের ভিখারি। অথচ নানাবিধ ট্যাক্স দিয়ে জনগণ যে সরকারকে পোষে, জনগণের জমি ও সম্পদ রক্ষায় সেই সরকারের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ন্যূনতম পক্ষে নদীবাঁধগুলোকে শক্তপোক্ত করে বর্ষার আগে মেরামতের কোন উদ্যোগও তারা গ্রহণ করে না, বন্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী পরিকল্পনার বিষয় তো দূর অস্ত্। প্লাবনের মধ্যে বা প্লাবনের পরে ভিক্ষার মত সামান্য কিছু টাকা তারা ছুঁড়ে দেয় বাঁধ মেরামতির জন্য, আর বাজিয়ে দেয় সেই ভাঙা রেকর্ড — সরকারের টাকা নেই। সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ন্যূনতম দায়-দায়িত্বও তারা পালন করে না। ফলে মানুষ কার্যত অসহায়।

গ্রাম শহর সর্বত্র বেকারি মারাত্মক রূপ নিয়েছে। রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৬৯ লক্ষ। এর বাইরেও বিশাল বেকারবাহিনী। অন্যদিকে কলে-কারখানায় অফিসে যাদের চাকরি ছিল তাঁদেরও ছাঁটাই করা হচ্ছে; তাছাড়াও এ রাজ্যে এই মুহূর্তে ৪০ হাজার ছোট-বড় কলকারখানা বন্ধ। এই কাজ হারানো শ্রমিকের সংখ্যা বেকারবাহিনীকে করে তুলেছে বিশাল থেকে বিশালতর। কাজ হারানো শ্রমিক অনাহারে অর্ধাহারে রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মরছে। উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলিতে এমনিভাবে দেড় হাজার শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। কোথাও বা শ্রমিক নিজে, কোথাও বা সপরিবারে আত্মহত্যা করছে ক্ষুধার জ্বালায়। আবার কর্মহীন নিরুপায় কিছু মানুষ নেমে যাচ্ছে অন্ধকারময় পিচ্ছিল পথে, চুরি ডাকাতি ছিনতাই ওয়াগনভাঙা চোরাচালান নারীপাচার ইত্যাদির অপরাধ জগতে নাম লেখাচ্ছে তারা। মেয়েরাও নামছে এই পথে, নামছে দেহবিক্রির রাস্তায়।

কাজের আশায় শিক্ষিত বেকার ছুটছে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে — আরবে, ইরাকে, — যদি কিছু জোটে। আবার রাজ্যের সরকার এই বিপুল বেকারত্বের সুযোগে দিচ্ছে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের টোপ। বেকার যুবক সরকারি ঋণ নিয়ে প্রকল্প গড়ে নিজেই নিজেকে চাকরি দেবে। এরই গালভরা নাম স্বনিযুক্তি প্রকল্প। যেখানে বড় বড় কলকারখানা এই প্রতিযোগিতার বাজারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ২০-২৫ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে প্রকল্প গড়ে তা থেকে মুনাফা করে সংসার চালাবে — এ যে নিতান্তই দুরাশা — তা সরকারও ভাল করেই জানে। আর জানে বলেই, শিক্ষিত বেকাররা প্রকল্প গড়ে কতদূর এগোলো — সরকার তা ফিরেও দেখে না। ঋণ দেবার সময় তার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর কার্ডটি সরকার নিয়ে নেয় এবং সরকারি খাতায় লেখা হয়ে যায় যে, ঐ যুবক আর বেকার রইল না, বরং সে একজন প্রতিষ্ঠিত উপার্জনশীল যুবক। এবার দফায় দফায় সুদসহ সরকারি ঋণ ফেরত দেবার পালা। প্রকল্প অবধারিতভাবেই 'ফেল' করে। এরপর ব্যাঙ্ক ও পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া শিক্ষিত যুবকের সামনে অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। এবং এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাই বাস্তবে ঘটছে।

সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিক্ষা এখন সাধারণ পরিবারের সন্তানদের কাছে বাস্তবিকই দুর্মূল্য — বাজারী দামী পণ্য। যার টাকা আছে, একমাত্র তারই আছে শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশের অধিকার। স্কুল স্তরে বাড়ছে নানান ফি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বেতন বাড়ছে বিপুল হারে। শিক্ষায় ধনী-নির্ধনের সম অধিকার — একথা আজ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিচ্ছে। সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলির অবস্থা করুণ — স্কুলঘর নেই, শিক্ষক নেই, শিক্ষাদানের অবস্থা তথৈবচ, স্কুলে পাশফেলও নেই। ফলে যাদের একটু টাকা পয়সা আছে তারা সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে বেসরকারি স্কুলে ভিড় করছেন। আর যাদের সে উপায় নেই তারা পড়ে আছেন সরকারি স্কুলে। বহু অভাবী পরিবার সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর বিলাসিতাটুকুও করে না, সন্তানকে পাঠায় চায়ের দোকানে, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে — রাতদিন কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সে যদি নিজের পেটটাও চালাতে পারে।

বাজারে জীবনদায়ী ওষুধের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ম্যাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো দেদার মুনাফা লুটছে। মরছে সাধারণ মানুষ। একটা সাধারণ কোন অসুখ হলেও তার চিকিৎসার ব্যয়ভার যে হারে বাড়ছে তা সত্যিই আতঙ্কের। রক্ত সহ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচও তেমনভাবে বাড়ছে। কোন ভারি অসুখ হলে তো কথাই নেই। হাসপাতালে গরিব-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের 'ফ্রি'তে চিকিৎসার ও ওষুধ পাওয়ার যে সুযোগ আগে ছিল, সরকারগুলি 'টাকা নেই'-এর অজুহাত তার সব সুবিধাগুলি ছেঁটে ফেলছে। হাসপাতালে গিয়ে সামান্য একটু তুলো বা গজ-কাপড়ের দরকার হলে তাও কিনে আনতে হয় দোকান থেকে। সরকারি হাসপাতালগুলোকে নার্সিং হোমে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। ফলে গরিব সাধারণ মানুষকে হয় বিনা চিকিৎসায় ওষুধের অভাবে মরতে হবে, আর নয়ত দেবদেবীর জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির আশ্রয়ে যেতে হবে।

এর উপর সরকার ও পৌরসভাগুলি নিত্যনতুন ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে চলেছে। সরকার ও গোয়েঙ্কা কোম্পানির যোগসাজসে রাজ্যের গরিব-মধ্যবিত্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর চাপানো হচ্ছে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি। পেট্রল - ডিজেল - কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে, বাড়ানো হচ্ছে বাসট্রামের ভাড়া। আদিবাসী ও জঙ্গল এলাকার মানুষের জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে অনাহারে মৃত্যুর দিকে, মরছেও মানুষ। হাজারে হাজারে মানুষকে আর্সেনিক বিষযুক্ত জল পান করতে বাধ্য করা হচ্ছে, মানুষ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, মারাও যাচ্ছে। প্রতিবিধানের কোন উদ্যোগ নেই। জনগণকে রক্ষার কোন পরিকল্পনাই নেই। বরং মদ্যপান যাতে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া যায় — তার পরিকল্পনা করেছে সরকার; এবছর নতুন করে ১০০০ মদের দোকানের লাইসেন্স দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। হাল্কা নেশার মদ 'রেডি টু ড্রিঙ্ক' যাতে মুদির দোকান, চায়ের দোকানেও বিক্রি হয় — সরকার তার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি দল ও পুলিশের মদতে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে ভিডিও পার্লার — যেখানে অশ্লীল ব্লু-ফিল্মের রমরমা। এছাড়া টেলিভিশনের নানা চ্যানেলে সিরিয়াল, সিনেমা ও বিজ্ঞাপনের নামে নগ্ন নারী দেহের কুৎসিত প্রদর্শন চলছে। যৌবনকে বিপথগামী করো, বিবেক ও মনুষ্যত্বকে মারো। নইলে মানুষ মাথা তুলবে, প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হবে।

ফলে চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত-শ্রমিক — এককথায় সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক আক্রমণ হানছে সরকার ও শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই সাধ্যমত লড়াই করে চলেছে। ইতিমধ্যে কিছু দাবি সে আদায়ও করেছে। সেই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আসছে ৬ অক্টোবর। কোটি কোটি স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে লক্ষ মানুষের মহামিছিলে আলোড়িত হবে রাজধানী কলকাতা। হয় কোটি কোটি মানুষের দাবি মেনে নাও, নয়ত আগামী দিনে সরকারি অফিস ঘেরাও, অবরোধ, আইন অমান্যের মত আন্দোলনের সামনে দাঁড়াতে হবে — সরকারের উদ্দেশ্যে এই স্পষ্ট হুঁশিয়ারি নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই মহামিছিল।

বিদ্যুৎ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ শ্রমিক-চাষী সাধারণ মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে

২৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে

৬ অক্টোবর

মহামিছিল

জমায়েত — দেশবন্ধু পার্ক, বেলা ১২টা

দাবিপত্রে দলে দলে স্বাক্ষর দিন

তমলুক জেলে বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু ঃ তদন্ত দাবি

১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক জেল হেফাজতে মহেন্দ্রনাথ হালদার নামে ২২ বছরের এক বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। জেল কর্তৃপক্ষ জানায় এই বন্দি গলায় গামছার ফাঁসে আত্মঘাতী হয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ হালদারের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ থানার মন্মথপুর গ্রামে। শিল্পাঞ্চল হলদিয়ায় এক ঠিকাদার সংস্থায় তিনি কাজ করতেন। এখানে এক নাবালিকাকে তার বাড়ির অমতে বিয়ে করায় মেয়ের বাবা মহেন্দ্রর বিরুদ্ধে মেয়ে অপহরণের অভিযোগ আনেন, যে কারণে জামিন অযোগ্য ধারায় জেলে বন্দি ছিলেন মহেন্দ্র।

জেল হেফাজতে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও মৃত মহেন্দ্রর পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসক দপ্তরে এস ইউ সি আই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মানিক মাইতি ও তমলুক লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড প্রণব মাইতি।

শহীদ যতীন দাসের ৭৫তম আত্মোৎসর্গ বর্ষ উপলক্ষে ১২ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতায় প্রবল বর্ষার মধ্যে পদযাত্রা

পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া শিক্ষার স্বার্থে নয়

একের পাতার পর

গরিব মানুষ, নিম্নবিত্ত মানুষ যারা বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যয়বহুল শিক্ষা নিতে অপারগ, একমাত্র তারাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে সরকারি নীতি শিক্ষাব্যবসায়ীদেরই সুযোগ করে দিচ্ছে।

অবাধ প্রমোশন নীতির ফলে চতুর্থ শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়েছে কী তাদের হাল? হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়াতে গিয়ে দেখেছেন ঐ ছাত্রছাত্রীরা মূলত ক্লাসের পড়া ধরতে পারছে না, বুঝতে পারছে না। অভিভাবকরা দিশেহারা। কী করণীয় এই অবস্থায়? মুশকিল আসান প্রাইভেট টিউশন। প্রাথমিক শিক্ষায় পর্যন্ত এই যে প্রাইভেট টিউশনের রমরমা ব্যবসা এর অন্যতম কারণ পাশফেল তুলে দেওয়া। এটাই প্রমাণ করছে পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ায় ছাত্রদের শিক্ষাগত মান বাড়ছে না, তাদের শিক্ষার ভিত রয়ে যাচ্ছে খুবই দুর্বল এবং তা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত।

এই প্রেক্ষাপটেই খুঁজতে হবে ঠিক কী কারণে আজ অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার কথা সরকার ভাবছে। একথা ঠিক, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উপযুক্ত মান অর্জন না করেই যারা হাইস্কুলে ভর্তি হচ্ছে তাদের অধিকাংশই ফেল করছে। আর, পর পর দু'বার ফেল করলে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয় থেকে বিদায় (T.C) দেওয়া হচ্ছে। ফলে অষ্টম শ্রেণী পাশ করার আগেই যে ৮৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী শিক্ষাজগৎ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, তার কারণগুলির মধ্যে পাশফেল প্রথা বিসর্জনজনিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন না করা অন্যতম একটি কারণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে ড্রপআউট কমানোর কথা বলে পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছিল সেই ড্রপআউটই বেড়ে গেল এই সর্বনাশা নীতির ফলে। প্রাথমিক স্তরে পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে কোমলমতি লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েদের যে চরম সর্বনাশ ঘটানো হল, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবাধে পাশ করিয়ে দিয়ে সরকার সেই সর্বনাশের মাত্রা বাড়াতে চলেছে। ছাত্রছাত্রীসহ সমস্ত জনসাধারণকে ভেবে দেখতে হবে — যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তার পরিণামে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ধস নামবে, গণফেলের সূচনা ঘটবে।

এদেশে পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া কার্যকরী করার পথপ্রদর্শক সিপিএম হলেও, ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল, এবং আরও উচ্চতর স্তর পর্যন্ত গ্রেড সিস্টেম চালু করার কথা বলেছিল। পরবর্তীতে বিজেপিও এই নীতি অনুসরণ করেছে। তামিলনাডুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতাও ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে, শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে সিপিএমই আজ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। মার্ক্সবাদের নাম নিয়ে চলা এইসব সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলিই যে শোষিত মানুষের মুক্তির সামনে প্রধান বাধা তা লেনিন খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, এরা হচ্ছে মেষ-চর্মাবৃত বাঘ। তিনি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত সংগ্রামী মানুষদের এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সিপিএম তার চরিত্রানুযায়ী সেই সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ভূমিকা পালন করছে।

সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক প্রবর্তিত ডিপিইপি'রও অন্যতম সিদ্ধান্ত হল, অটোমেটিক প্রমোশন — প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাশফেল প্রথা থাকবে না, থাকবে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে একই ক্লাসে কোন ছাত্রকে দু'বার রাখা চলবে না — এটাই হল বিশ্বব্যাঙ্ক তথা ডিপিইপি'র নির্দেশ। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সরকারি শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে দেখতে হবে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছিল তাতে স্পষ্টতই ছিল শিক্ষা সংকোচনের ঝোঁক। সেই সময়ই সরকারি শিক্ষানীতির প্রণেতারা বলেছিলেন, 'education, specially higher education is not for all' অর্থাৎ শিক্ষা এবং বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষা সকলের জন্য নয়। কেন তারা একথা বলেছিলেন? ১৯৫৭ সালে ইউ জি সি'র চেয়ারম্যান সি ডি দেশমুখ বলেছিলেন, 'We want to restrict education in order to minimise the number of educated unemployed' — অর্থাৎ শিক্ষিত বেকার কমানোর জন্য আমরা শিক্ষা সংকোচন করতে চাই। আর এই শিক্ষা সংকোচনের বিভিন্ন পদক্ষেপ হিসাবে সেদিন থেকে অদ্যাবধি একের পর এক আসন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল - কলেজ না খোলা, ব্যাপক ফি বৃদ্ধি করে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া, পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার ভিত্তি ধসিয়ে দেওয়া, ইংরেজি তুলে দিয়ে উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার দরজা বন্ধ করা প্রভৃতি একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। অন্যদিকে পাঠ্যবিষয় ও পাঠদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে এমন সব নীতি নিচ্ছে যাতে ছাত্রদের কোন বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক ও সুসংবদ্ধ ধারণা গড়ে না ওঠে।

শিক্ষাব্যবস্থা হল একটা অর্থনৈতিক ভিতের উপর গড়ে ওঠা উপরিকাঠামো। এই অর্থনৈতিক ভিতে সঙ্কট দেখা দিলে তার প্রতিফলন উপরি কাঠামোতে অবশ্যম্ভাবীরূপে পড়ে। বেকার সমস্যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য সমস্যা। পুঁজিবাদ যত দীর্ঘায়িত হবে এই সমস্যা তত তীব্ররূপ ধারণ করবে। ফলে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। আবার বেকার সমস্যার বৃদ্ধি পুঁজিবাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। এই বেকার বাহিনী যদি শিক্ষার আলো পায়, তাহলে লেনিনের ভাষায় তা বারুদে অগ্নিসংযোগের সামিল। সেই কারণে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত একটি সরকার কখনই যথার্থ শিক্ষার বিস্তার চায় না, তারা শিক্ষা সংকোচন করতেই সদা তৎপর।

পাশফেল প্রথা তুলে দিতে গিয়ে সিপিএম যে বিভ্রান্তিটা ছড়ায় তাহল প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে সারা বছর ধরে মূল্যায়ন ব্যবস্থা অনেক ভাল। কিন্তু যেটা তারা বলেনা, তা হচ্ছে, নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে, শিক্ষার যে ন্যূনতম পরিকাঠামো থাকা দরকার, তা এখানে নেই। মূল্যায়ন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন (ক) পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা, (খ) ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ২০ : ১, (গ) বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেওয়া, (ঘ) উপযুক্ত পরিকাঠামো, (ঙ) ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসা সুনিশ্চিত করা। সরকার যদি মূল্যায়ন ব্যবস্থা সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে চায় তাহলে উপরোক্ত ন্যূনতম শর্তাবলী তো প্রথমেই পূরণ করবে। এইসব ক্ষেত্রে সরকারি বক্তব্য কী? তারা বলছে, স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ হবে না, ২০০০ টাকা বেতনের প্যারাটিচার দিয়ে কাজ চালাতে হবে, মাল্টি-ক্লাস টিচিং অর্থাৎ একজন শিক্ষক ২/৩টি ক্লাসে যুগপৎ শিক্ষাদান করবেন। এই পদ্ধতিতে কি মূল্যায়ন সম্ভব? বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়নের নামে শিক্ষকদের কেরানি বৃত্তিতে নামানো হয়েছে এবং মূল্যায়নের খাতা তৈরিতেই তাদের সময় চলে যাচ্ছে। বেশিরভাগ স্কুলেই তো পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। ফলে পড়াশুনা ঠিকমত হয় না। মূল্যায়ন কী হবে? মূল্যায়নে যদি ধরা পড়ে কোন ছাত্র ভাল শেখেনি, পরবর্তী ক্লাসে পড়ার অনুপযুক্ত তাহলে তাকে প্রমোশন না দেওয়াই বিধেয়। সেটাই যথার্থ মূল্যায়ন। বাস্তবে মূল্যায়ন ও পাশফেল প্রথার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মূল্যায়নেও পরীক্ষা নিতে হয়, পাশফেল প্রথাতেও নিতে হয়। সার্থক মূল্যায়ন সেটাই যেখানে অযোগ্যকে যোগ্যতা অর্জনের জন্য একই ক্লাসে রেখে দেওয়া হয়। অযোগ্যকে যোগ্যতার লেবেল লাগিয়ে উঁচু ক্লাসে তুলে দেওয়া কোন মূল্যায়নই নয় — অবমূল্যায়ন, এবং জেনে শুনে একটা ছাত্রের চূড়ান্ত সর্বনাশ করা। বামফ্রন্ট সরকার সেই কাজটিই করছে, আর একশ্রেণীর অন্ধ স্তাবক, 'পবিত্র' বুদ্ধিজীবী 'তা বটে, তা বটে ঠিক' বলে মোসাহেবি করে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে।

ফলে যথার্থ মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা বামফ্রন্টের লক্ষ্য নয়। মুখে শিক্ষার প্রগতি, আধুনিকতা, শিক্ষার সার্বজনীনতা — এইসব সুন্দর সুন্দর কথার আড়ালে বাস্তবে শিক্ষায় চূড়ান্ত নৈরাজ্য আনাই তাদের লক্ষ্য — যাতে করে শিক্ষার দরজা দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের ব্যবসার জন্য খুলে দেওয়া যায়। এবং এই প্রক্রিয়ায় সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করা যায়।

রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষেরা সিপিএম সরকারের হাতে শিক্ষার এই অপমৃত্যু হতে দেবেন কি? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার স্বার্থে আন্দোলনে সামিল হয়ে এই ষড়যন্ত্র আটকাতেই হবে। এস ইউ সি আই সেই আন্দোলন গড়ে তুলছে।

মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে

তৃতীয় সারা বাংলা বিজ্ঞান সম্মেলন

১৫ - ১৭ অক্টোবর ২০০৪

কলকাতা

উদ্যোগে : ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি

৯ ক্রীক রো, কলকাতা ৭০০০১৪ ফোন : ২২৪৬-০৫৬৩

মহান মাও সে-তুঙ স্মরণসভা

উত্তর ২৪ পরগণা

গত ৯ সেপ্টেম্বর মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, চীন বিপ্লবের রূপকার কমরেড মাও সে-তুঙ এর ২৮তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে এস ইউ সি আই ব্যারাকপুর মহকুমার উদ্যোগে শ্যামনগর ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার হলে এক মহতী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অজিত কুণ্ডু। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল সেন। কমরেড সেন সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড মাও-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, তাঁর দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধান এবং শোষিত মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সভার মূল বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই-এর অন্যতম সংগঠক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি বলেন যে, মানুষের মুক্তির সত্যিকারের পথ খোঁজার ক্ষেত্রে কমরেড মাও অন্ধতা, যুক্তিহীনতা এবং অহংবোধকে কখনই নিজের মধ্যে প্রশ্রয় দেননি। চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনন জগতের বিশেষত্ব অনুযায়ী তিনি চীনের মাটিতে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত করেছিলেন। অতি বাম এবং অতি দক্ষিণপন্থী নেতাদের সাথে নিরন্তর মতবাদিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি মার্কসবাদের সার্থক সৃজনশীল রূপ দিয়েছিলেন। আজ একমেরু বিশ্বের দাবিদার সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তিগুলি প্রচার করছে যে মার্কসবাদ ব্যর্থ এবং ভুল। আমাদের দেশের মেকী বামপন্থীদের কার্যকলাপেও মানুষ হতাশ। তাই আজ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে-তুঙ চিন্তাধারার সার্বজনীন সত্যকে তুলে ধরার প্রয়োজন আরও বেশি।

বাঁকুড়া

৯ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই জেলা পার্টি অফিসে চীন বিপ্লবের রূপকার মাও সে-তুঙ স্মরণ দিবসে সকালে পতাকা উত্তোলন ও মাও সে-তুঙের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল।

ঐ দিন বিকেল ৩টায় এক কর্মীসভায় মাও সে-তুঙের রচনাবলী পাঠ করা হয়। এই সভায় রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী চীন বিপ্লবের বিভিন্ন দিক সহ মহান মাও সে-তুঙের স্মরণদিবস পালনের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

মহারাষ্ট্র

জাপানি সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের অধীনস্থ, আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন চীনের জনগণকে মার্কসবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেওয়ার নায়ক মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড মাও সে-তুঙের স্মরণ দিবস পালিত হল ৯ সেপ্টেম্বর নাগপুরের ভুরে ভবন বৈদ্যনাথ চকে। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই-এর নাগপুর কমিটির সম্পাদক কমরেড মাধব ভোন্ডে। প্রধান বক্তা কমরেড সোনু ব্যানার্জী কমরেড মাও সে-তুঙের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই গরিব মেহনতী মানুষের মুক্তি সম্ভব। সভা পরিচালনা করেন কমরেড রবীন্দ্র সাখরে।

ধর্মভিত্তিক জনগণনার রিপোর্ট

একের পাতার পর

গতিতে সাম্প্রদায়িক প্রচারে নেমে পড়ার পরই কংগ্রেস সরকার তা পুনর্বিচারের কথা বলে। কিন্তু একথা কংগ্রেস একবারও বলেনি যে, তাদের অজ্ঞাতে এই পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে বা এ ধরনের ভুল তথ্য প্রকাশ করা উচিৎ হয়নি।

আরও লক্ষণীয়, এই তথ্য প্রকাশের পরই প্রভাবশালী মুসলিম নেতাদের একাংশ উদ্বেগ প্রকাশ করেন ও এর পিছনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন। বিজেপি নেতারাও শুরুতে এই ইস্যু নিয়ে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং নরেন্দ্র মোদির স্লোগান ''হাম দো হামারা পঁচিশ — নেহি চলেগা'' বলে আওয়াজ তুলেছিল, তারাই অতি দ্রুত 'অনুপ্রবেশই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ'' বলে ঘোষণা করে ইস্যুটাকে জন্মহার থেকে ঘুরিয়ে ''অনুপ্রবেশে'' টেনে এনেছে।

পর পর এসব ঘটনা থেকে কতগুলি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। প্রথমত, অতীতের সমস্ত নজির ভেঙে বিজেপি জনগণনার ধর্মভিত্তিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করালো কেন? দ্বিতীয়ত, বিজেপি সরকারে থাকাকালে আদবানীর নির্দেশে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই যে বিশ্লেষণ করানো হয়েছিল একথা জানা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার তা প্রকাশ করতে দিল কেন? তৃতীয়ত, মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি এবং তার ফলে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার আশঙ্কার বিষয়টি বিজেপি'র পুরনো লাইন হওয়া সত্ত্বেও এবং গোড়ায় সে ইস্যু তুললেও তা থেকে সরে এসে বিজেপি অনুপ্রবেশের ইস্যু আঁকড়ে ধরল কেন?

সকলেই জানেন, সম্প্রদায়িক উত্তেজনা খুঁচিয়ে তোলার হাতিয়ার হিসাবে 'মুসলিম পুরুষদের বহুবিবাহ' এবং সেজন্য 'বহু সন্তানের' ইস্যুটি বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই তুলে আসছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাছাকাছি সময় এই প্রচারটা বিজেপি তুঙ্গে তোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যুক্তিবিচারে তাদের প্রচারের ফাঁকিটা ধরা পড়তে দেরি হয়নি। অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ ধরে ফেলেন প্রথমত, মুসলমানরা সকলেই বহু বিবাহ করে না। দ্বিতীয়ত, সংসারে বাড়তি কাজের লোক আনার জন্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বী দরিদ্র মানুষের মধ্যেও বহু বিবাহ চালু আছে। তৃতীয়ত, একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্তানধারণে সক্ষম নারীর সংখ্যাই এক্ষেত্রে বিচার্য, কারণ পুরুষের এক বিবাহ বা বহুবিবাহ সন্তানসংখ্যার নির্ধারক নয়। আরও বলা হয় এবং এবারের জনগণনা বিশ্লেষণেও প্রমাণিত যে শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা বহু সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রধান কারণ। এজন্যই, দেখা গিয়েছে, কেরালায় শিক্ষার প্রসার ঘটার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও সন্তান সংখ্যা কম, আবার শিক্ষায় অনগ্রসর বিহার ও উত্তরপ্রদেশে হিন্দুদের মধ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ইস্যু খুঁজছিল হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখার জন্য। গুজরাটের পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক গণহত্যা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুদের মধ্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা বুঝতে বিজেপির অসুবিধা হয়নি। ফলে লোকসভা নির্বাচনের মুখে 'হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককে' নিজেদের পক্ষে রাখার একটা কৌশল উদ্ভাবন করা বিজেপি'র পক্ষে অপরিহার্য ছিল। জনসংখ্যার এই সাম্প্রদায়িক বিশ্লেষণ — যা লালকৃষ্ণ আদবানী নিজে নির্দেশ দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন — লোকসভা নির্বাচনে তা কাজে লাগিয়ে হিন্দুদের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে ভবিষ্যতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে ব্যাপক হিন্দু ভোট টানার চেষ্টা করাটাই বিজেপি'র পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত পেশাদার মার্কেটিং সংস্থার পরামর্শে, আরও বেশি কার্যকরী হবে ভেবে বিজেপি নেতারা ''ভারত উদয়'' প্রচারে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টার ওপর বেশি জোর দিয়েছিল, যদিও ভোটের হিসাবে তা কাজে লাগেনি।

কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার আসার পর বিজেপি পড়ে যায় ইস্যুর সংকটে। আগামীদিনে গদিতে বসার তাগিদে কংগ্রেস শাসনে ক্ষুব্ধ মানুষের ভোট পেতে বিজেপিকে কংগ্রেসের বিরোধিতা করতেই হবে। অথচ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্নে বিরোধিতা করার উপায় নেই, কারণ বিজেপি তার পাঁচ বছরের শাসনে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ দেখার জন্য যে আর্থিক নীতি নিয়ে চলেছে, তার প্রণেতা কংগ্রেস। বিজেপি'র বদলে গদিতে বসে কংগ্রেসের ইউপিএ সরকারও মূলত সেই নীতি নিয়েই চলছে। ক্ষমতায় বসে বাইরে হিন্দুত্বের গর্জনের তলায় বিজেপি যেমন দেশিবিদেশি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ দেখেছে, কর ছাড় দেওয়া থেকে শুরু করে সবরকম সরকারি সাহায্য দিয়ে তাদের সেবা করেছে এবং তা করার জন্য জনসাধারণের উপর কর-দর বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়েছে; সিপিএমের সার্টিফিকেট নিয়ে গদিতে বসে, ধর্মনিরপেক্ষতার বাগাড়ম্বরের তলায় কংগ্রেসও সেই একই কাজ করছে। কাজেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নীতিগত ক্ষেত্রে লোকদেখানো কংগ্রেস বিরোধিতার সুযোগও বিজেপি'র সামনে নেই। ফলে বিজেপি জাতীয় রাজনীতিতে, বিশেষত আসন্ন মহারাষ্ট্র নির্বাচনে আশু ফায়দা তুলতে তার পুরনো মূল উগ্র সাম্প্রদায়িক লাইনের ওপর বাড়তি জোর দিচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতা উস্কে তোলা ছাড়া জনগণনায় ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিভাজন দেখানোর আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আধুনিককালে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী জনগণনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হিসাব নেওয়া যাতে তার ভিত্তিতে সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে, সঠিক পরিকল্পনা নিতে পারে এবং সঠিক জায়গায় অগ্রাধিকার দিয়ে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে দ্রুত উন্নত করে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে ন্যূনতম আধুনিক জীবনের শরিক করতে পারে। দেশের মানবসম্পদের বাস্তব অবস্থাটা জেনে, জনগণের মধ্যেকার সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তার ব্যবহার ঘটাতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায়, রাজতন্ত্রের যুগে জনগণের প্রত্যেককে ধরে ধরে নিংড়ে সম্ভাব্য সর্বাধিক কর আদায় করার জন্য রাজা-মহারাজারা জনগণনা শুরু করে। আধুনিক যুগে জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি এবং সরকারের আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণের পরিসংখ্যানগত বনিয়াদ হিসাবেই জনগণনা করা হবে — এটাই ছিল লক্ষ্য, যা এখন বুর্জোয়া সরকারগুলি জলাঞ্জলি দিয়েছে।

আধুনিক যুগে জনগণনার উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা ও তার নজিরবিহীন সাফল্যের নেপথ্যে নিখুঁত জনগণনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেখানে জনগণের ধর্মীয় ও ভাষিক পরিচয় নেওয়া হয়েছিল সেই বিশেষ ধর্মীয় বা ভাষিক জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি ঘটানোর জন্য সঠিক নীতি গ্রহণ বা সঠিক জায়গায় অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বলাবাহুল্য বহু ভাষা, বহু ধর্ম অধ্যুষিত, জাতিবিদ্বেষ ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে জর্জরিত প্রদেশগুলিকে স্বেচ্ছাবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি যে ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেছিল তা দুনিয়ার সকল প্রকৃত গণতন্ত্রীকে অভিভূত করেছিল। এমন ঐক্য, এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভারতেও কেন হয়নি — তা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে তাদের শোষণের স্বার্থে বিভেদনীতি নিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে তুলেছিল। স্বাধীন ভারতে পুঁজিবাদী শোষণের স্বার্থে শাসকশ্রেণী একে টিকিয়ে রেখেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর দলগুলি, শাসকদল বা বিরোধী উভয়েই নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক তৈরি এবং নিজেদের জনবিরোধী কার্যকলাপকে চাপা দেওয়ার স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে অন্যতম হাতিয়ার করেছে।

বিজেপি উগ্রভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করছে, কংগ্রেসও একই 'হিঁদুয়ানিকে কাজে লাগাচ্ছে, পার্থক্য কেবল উগ্রতার মাত্রায়। লজ্জার কথা, সিপিএমও একে কাজে লাগাচ্ছে ভিন্ন পথে। একদিকে সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে অজুহাত খাড়া করে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর মতো জনবিরোধী সিদ্ধান্তকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য চেহারা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে বিজেপি'র অপর একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ইস্যু, অনুপ্রবেশ ও আইএসআই-এর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি তারা বিজেপি'র গ্রহণযোগ্য করেই বলছে। এই ইস্যুতে বিজেপি ক্ষমতাসীন থাকাকালে তার সঙ্গে তারা সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এর দ্বারা সিপিএম নেতৃত্ব এ রাজ্যের সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে কংগ্রেসের কায়দায় সংখ্যালঘু ত্রাতা সেজে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির হীন রাজনীতি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি অনুপ্রবেশ সমস্যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টিকে জুড়ে দিয়ে, সংখ্যালঘুবিরোধী জিগির তুলছে।

আমরা আগেই দেখিয়েছি, জন্মহার বৃদ্ধির প্রশ্নটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ। একইভাবে মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধি আর অনুপ্রবেশ দু'টি পৃথক সমস্যা। বিশ্বের সর্বত্র অনুপ্রবেশের সমস্যা আছে। পার্শ্ববর্তী গরিব দেশ থেকে রুটি রুজির জন্য প্রতিবেশী তুলনামূলকভাবে অগ্রসর দেশে আইনি-বেআইনি দুভাবেই অভিবাসন প্রায় সর্বত্র ঘটে। বাংলাদেশ থেকে কেবল মুসলমানরাই নয়, গরিব হিন্দুরাও এদেশে আসে যথেষ্ট সংখ্যায়। এটা বিজেপিও জানে, তাই অনুপ্রবেশের মানবিক সমস্যায় সাম্প্রদায়িক রঙ চড়াতে তারা হিন্দুদের 'শরণার্থী' ও মুসলমানদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলে চিহ্নিত করে। এই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপ চিনিয়ে দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল কংগ্রেস সব জেনেশুনেও জনগণনা বিশ্লেষণের এই ভ্রান্ত পরিসংখ্যানটি বিজেপির হাতে হাতিয়ার হিসাবে তুলে দিল কেন? আসলে কংগ্রেসও এর মধ্যে ভোটের স্বার্থের গন্ধ পেয়েছে। তারা জানে, বিজেপি হিন্দুত্বের গর্জন শুরু করলেই আতঙ্কিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরবে। বেপরোয়া মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি আর্থিক সংকট, যা কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে বা শিক্ষায় হিন্দু জ্যোতিষ পড়ানো, অযোধ্যায় বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দিরের অস্তিত্ব স্বীকার প্রভৃতি কংগ্রেসের হিন্দু ঘেঁষা ন্যাক্কারজনক ভূমিকা সত্ত্বেও বৃহত্তর বিপদের ভয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কংগ্রেসকে অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। তাই প্রথম দিন জনগণনার ভ্রান্ত পরিসংখ্যান প্রচার করার সুযোগ করে দিয়ে তার পরদিনই তারা তা পুনর্বিবেচনার জন্য গ্রহণ করেছে। বিজেপি'র ধর্মভিত্তিক জনগণনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং সে ব্যাপারে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ দুয়েরই মূল লক্ষ্য হল সম্প্রদায়ভিত্তিতে জনসমর্থন কবজা করে ভোটে তার ফায়দা তোলা। এর সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণের কোন স্বার্থ নেই, এ কথা যেমন হিন্দু জনগণকে বুঝতে হবে, তেমনি সংখ্যালঘু জনগণকে বুঝতে হবে কংগ্রেসকে ধরে বা মেকি বামপন্থীদের সাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা বিপদ থেকে রক্ষা পাবে না। দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী কংগ্রেস-বিজেপি এবং আপসমুখী সিপিএমের রাজনীতিকে পরাস্ত করে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই তাঁদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি।

বন্ধ্যা বীজে বিপন্ন চাষীদের আন্দোলন

একের পাতার পর

করে জানা যায়, বেশির ভাগ চাষী ঋণ নিয়ে, কেউ কেউ বাড়ির সোনার গহনা বন্ধক দিয়ে চাষ করেছেন। এইসব ঋণগ্রস্ত-সর্বস্বান্ত চাষীরা উদ্বিগ্ন, হতাশাগ্রস্ত। অনেকে নিষ্কৃতি পেতে আত্মহত্যার প্রহর গুনছেন। বাঁচার তাগিদে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন। এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন। গত ৯ সেপ্টেম্বর সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে কপি চাষীরা সংগঠিত হয়ে বাদুড়িয়ায় কৃষি দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ফুলকপি গাছ আগুনে পুড়িয়ে প্রতিবাদ করেন এবং দাবি তোলেন — (১) এক্ষুনি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ দলকে দিয়ে তদন্ত করতে হবে ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে, (২) ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের বিঘা প্রতি ৪০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও (৩) বন্ধ্যা বীজের জন্য দায়ী বীজকোম্পানিগুলোকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এরপর বিক্ষোভকারীদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত সভা হয় এবং বীজকোম্পানির রাজ্যস্তরের প্রধান সেল্স কাউন্টারের সামনে বিক্ষোভ ও ধর্না দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, বীজের কারণে চাষীদের উপর নেমে আসা এই আক্রমণ কি অনিবার্য ছিল? নাকি অন্য কোনও উপায় ছিল? আসলে কোনও বীজ চাষীর হাতে পৌঁছাবার আগে তা যথোপযুক্ত কিনা, ফলন দিতে সক্ষম কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা বা নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির তরফ থেকে নেই। ফলে বীজ কোম্পানিগুলি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজারে চাষীর কাছে অবাধে বীজ বিক্রি করে এবং কোটি কোটি টাকার মুনাফার পাহাড় জমায়। এই ঘটনা শুধু বীজের ক্ষেত্রে নয়, সার-কীটনাশকের ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকরী। সার-কীটনাশকে ভেজালদারি করে চাষীদের ঠকিয়ে কোটি কোটি টাকার মুনাফাবাজি চলছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যেমন নিত্য নতুন আক্রমণ নামিয়ে জনসাধারণকে নিঃস্ব ভিখারি করছে, তেমনি দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলোকেও কৃষক সমাজকে লুণ্ঠন করার অবাধ সুযোগ করে দিচ্ছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শরৎচন্দ্রের ১২৯তম জন্মদিবস পালন

সারা বাংলা ১২৫তম শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নবজাগরণের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১২৯তম জন্ম দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় মাল্যদান ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও বিকালে কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে প্রায় পাঁচ শতাধিক শরৎ অনুরাগীর উপস্থিতিতে উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা সভা শুরু হয়। কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক মানিক মুখোপাধ্যায় ''শরৎ সাহিত্য, শরৎচন্দ্রের জীবন ও শরৎ সংস্কৃতির চর্চার পথ বেয়েই আজকের যুগে নতুন উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব'' এই বিষয়ের উপর প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করেন। সভা পরিচালনা করেন কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

নদীর জলবণ্টন সমস্যা
একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাঞ্জাব-হরিয়ানার বহু বর্ষব্যাপী বিরোধ — সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও অপদার্থতার উদাহরণ

কেন্দ্রীয় সরকারও আলাদা কিছু নয়। এ সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের আলোকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিশ্বাসঘাতকতার বিচার করা দরকার। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে পৃথিবীর সর্বোত্তম খাল-ব্যবস্থা সমন্বিত পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের (তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান) অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের অংশে আসে মাত্র ২০ ভাগ সেচসেবিত পূর্ব পাঞ্জাব। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নদীজল বন্টনের প্রশ্নটি অমীমাংসিত ছিল। ১৯৬০ সালে দুটি দেশের মধ্যে পূর্বোল্লেখিত 'সিন্ধু নদ জল চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। রাজস্থানের বিস্তীর্ণ মরুভূমি ভারতে থাকায় ঐ চুক্তিতে ভারতবর্ষকে জলের বেশি অংশ দেওয়া হয়। এরপর ভারত সরকার নদী বাঁধ এবং সংযোগকারী খাল সমেত বহুমুখী নদীপ্রকল্প হাতে নেয়, যার অন্যতম হল ভাকরা-নাঙ্গাল এবং বিপাশা প্রকল্প। অবশ্য ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ শাসকরাই এই দুই প্রকল্পের খসড়া তৈরি করেছিল এবং ১৯৪৫ সালে ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পের চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত হয়েছিল। বর্তমান পাঞ্জাবের ভাতিন্ডা ও সাংগ্রুর, এবং বর্তমান হরিয়ানার রোহ্‌টক, গুরগাঁও, মহিন্দরগড় ও হিসার — এই ৬টি জেলার জন্য ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ প্রকল্প ১৯৫৮-৫৯ সালে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। সেইসময় রাজ্যগুলির গঠন অন্যরকম ছিল। সেই সময়কার একটি রাজ্য 'পেপসু' — মহীন্দরগড় যার অন্তর্ভুক্ত ছিল — ১৯৫৬ সালে নিজের অংশের নদীজল সমেত পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৬ সালে 'যার যেমন আছে তেমনই অধিকার থাকবে' — এই নীতিতে সংযুক্ত পাঞ্জাব ভেঙে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে দুটি পৃথক রাজ্য গঠিত হয়। পূর্বেকার অধিকারের কথা মাথায় রেখে হরিয়ানাকে জলসম্পদের ভাগ দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু সেই জল এবং বিদ্যুতের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এর দ্বারাই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে বিবাদের বীজ বপন করা হয়।

অথচ এ ব্যাপারে কোন নির্দেশিকা যে ছিল না এমন নয়। পাঞ্জাব পুনর্গঠন আইন ১৯৬৬-র ৭৮(১) ধারায় বলা হয়েছিল — "এই আইনে যাই-ই বলা হোক না কেন ... ভাকরা-নাঙ্গাল এবং বিপাশা প্রকল্পে বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্যের যে যে অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে, উত্তরাধিকারী রাজ্য হিসাবে সেই সেই অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে হরিয়ানারও। এই অধিকার ও দায়িত্বের পরিমাণ নির্ধারণ ও তা পরিবর্তন কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ সাপেক্ষে দুই রাজ্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে করতে পারবে। যদি দুই রাজ্যের মধ্যে কোন চুক্তি না থাকে ... কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ বলে তা করতে পারবে।"

পরবর্তী সময়ে যে সব ঘটনা ঘটল তা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পাঞ্জাবের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছাতে না পেরে হরিয়ানা ১৯৬৯ সালে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে যায়। কেন্দ্র রাভি এবং বিপাশা নদীর উদ্বৃত্ত জল বন্টনের বিষয়ে ১৯৭৬-এর ২৪ মার্চ রায় দেয়। পাঞ্জাব তাতে সম্মতি না দিয়ে ১৯৭৯-এর ১৭ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে তাদের আপত্তি জানায়। এরপর পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীরা ১৯৮১-র ৩১ ডিসেম্বর নতুন এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন; পাঞ্জাব সরকার সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা তুলে নেয় এবং 'এস ওয়াই এল' খাল (শতদ্রু-যমুনা লিংক) ২ বছরের মধ্যে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভিত্তিতে পাঞ্জাব বিধানসভা এই নতুন চুক্তিকে অনুমোদন করে। হরিয়ানা সরকার এই উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব সরকারের কাছে এক কোটি টাকা জমাও দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে হরিয়ানা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার টালবাহানা করায় এবং পাঞ্জাব অশান্ত হয়ে ওঠায় সবকিছু অন্যরকম হয়ে যায়।

শেষপর্যন্ত ১৯৮৫ সালের ২৪ জুলাই রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তির মাধ্যমে নদীর জলবন্টনের বিষয়টি রাভি-বিপাশা ওয়াটার ট্রাইব্যুনাল-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিচারপতি ভি বালকৃষ্ণন ইরাডির সভাপতিত্বে ১৯৮৬-র ১২ এপ্রিল গঠিত এই ট্রাইব্যুনাল ১৯৮৭-র জানুয়ারিতে পেশ করা রিপোর্টে বলে, হরিয়ানার কৃষকদের জীবনমরণের প্রশ্ন এই খালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ট্রাইব্যুনাল অবিলম্বে খালটি তৈরি করার সুপারিশ করে।

সেই সুপারিশ অনুযায়ী পাঞ্জাবের সুরজিৎ সিং বার্নালা সরকার ১৯৮৭-র মে মাসের মধ্যে খালটির ৮৫ ভাগ নির্মাণকাজ শেষ করে। এরপর বার্নালা সরকার ভেঙে দিয়ে কেন্দ্র পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এবং খাল তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত সেই কাজ আর শুরু করা হয়নি। আশ্চর্যের বিষয়, ট্রাইব্যুনাল রিপোর্ট দেওয়ার সতেরো বছর পর, এমনকী আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলের সভাগুলিতে বারংবার এই রিপোর্টের উল্লেখ সত্ত্বেও ইরাডি ট্রাইব্যুনালের এই রিপোর্ট সরকারিভাবে ঘোষিত হয়নি।

২০০২-এর ১৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট পাঞ্জাব সরকারকে ১ বছরের মধ্যে খাল নির্মাণ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। এবং বলেছিল, পাঞ্জাব সরকার যদি তা করতে না পারে তাহলে একাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। কেন্দ্র বা রাজ্য কোন সরকারের দিক থেকেই উপযুক্ত উত্তর না পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট আবার একবার হরিয়ানা সরকারকে খাল নির্মাণের পরিকল্পনা পেশ করতে বলে, যাতে সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে খাল নির্মাণের আদেশ দিতে পারে। সংবাদে প্রকাশ, হরিয়ানা সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে পেশ করা পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় জল কমিশন এবং হরিয়ানা সরকারের যৌথ তত্ত্বাবধানে একটি 'বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন'-কে দিয়ে খাল নির্মাণের কাজ করার অনুরোধ করেছে। অন্যদিকে পাঞ্জাব সরকার এই খাল নির্মাণ বন্ধ করে দেবার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এইসব ঘটনাগুলি স্পষ্টই দেখায়, সাধারণ মানুষের জীবনের পক্ষে নদীর জলের মতো অপরিহার্য উপকরণ নিয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি কতদূর বিশ্বাসঘাতকতা ও অপদার্থতার পরিচয় দিতে পারে!

রাজ্য সরকারগুলির মতোই কেন্দ্রীয় সরকারে যখন যারাই থাকুক, তারা কেউই জলসমস্যা সমাধানের জন্য কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়নি। সেচ, বিদ্যুৎ এবং পানের জন্য যতটা জল দরকার তা যাদের নেই, সেই জলাভাবগ্রস্ত রাজ্যগুলির জন্য জলসম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে বহুমুখী নদী প্রকল্প তৈরি করার যে কাজ কেন্দ্রীয় জল কমিশনের করা উচিত ছিল, দীর্ঘদিন ধরে তা বাকি পড়ে রয়েছে। হরিয়ানার জন্য প্রস্তাবিত 'কিসাউ বাঁধ জল প্রকল্প' এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে বিবাদের অপর একটি বিষয় হল — রাভি-বিপাশা নদীতে আদৌ উদ্বৃত্ত জল আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে ইরাডি ট্রাইব্যুনালের নির্দিষ্ট করে দেওয়া পুরো জল পাঞ্জাব ব্যবহার করছে কিনা — এ সংক্রান্ত প্রশ্ন।

ইরাডি ট্রাইব্যুনালের রিপোর্টে যে রূঢ় সত্যটি প্রকাশিত, তা হল — হরিয়ানার জন্য বরাদ্দ ৩৮.৩০ লক্ষ একর ফুট জলের মধ্যে প্রকৃতই হরিয়ানা পায় ১৬.২০ লক্ষ একর ফুট। অবশিষ্ট জল পাঞ্জাবেই থেকে যায়। পাঞ্জাব ৫০ লক্ষ একর ফুট জলের মধ্যে মাত্র ৩১.০৬ লক্ষ একর ফুট জল ব্যবহার করে। অবশিষ্ট প্রায় ৪০ শতাংশ জল নদীপথে বয়ে যায়। রাজস্থান তার জন্য বরাদ্দ ৮৬ লক্ষ একর ফুট জলের মধ্যে ব্যবহার করে ৪৯.৮৫ লক্ষ একর ফুট। অর্থাৎ সামগ্রিক হিসাবে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত জল নদীতে বয়ে সমুদ্রে পড়ে। কোনও নদী, নদীখাত কিংবা সমুদ্রের কাছাকাছি মোহানা অঞ্চলে পলি জমতে না দেওয়ার জন্য যতটা জলস্রোত দরকার তার থেকে বেশি জল নদীখাতে বইলে তাকে উদ্বৃত্ত জল বলা হয়। রাভি এবং বিপাশা নদীর মোহানায় পাকিস্তানের কয়েকটি বন্দর আছে এবং সেইসব এলাকায় পলি জমার কোনও রিপোর্ট নেই। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ভারতের পাঞ্জাব এবং রাজস্থানে যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হয়ে এই নদীগুলির জলের অপচয় ঘটছে। হরিয়ানা এই উদ্বৃত্ত জল না পাওয়ায় তা ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং উদ্বৃত্ত জলের অপচয় ঘটছে।

জলসমস্যা সমাধানে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন

এই সমস্ত তথ্য-পরিসংখ্যান এবং বৃহৎ সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির যে ভূমিকা আলোচিত হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। পূর্বোক্ত বিচারের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের দল এস ইউ সি আই পাঞ্জাব বিধানসভায় পাশ করা 'পাঞ্জাব টার্মিনেশন অফ এগ্রিমেন্ট বিল, ২০০৪'-এর নিন্দা করেছে। প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে অনুরোধ, আমরা এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নগুলি তুলেছি, সেগুলি বিবেচনার মধ্যে নিয়েই যেন নদী জলবন্টন সমস্যা বা সামগ্রিক জলবন্টন সম্পর্কে আমাদের দলের বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করেন।

আমরা সকলেই জানি যে, রাজস্থানের বিরাট অংশ হচ্ছে মরুভূমি, রাজ্যটির মধ্যে দিয়ে কোন বড় নদী বয়ে যায়নি, বা তার নিজস্ব কোন জলের উৎসও নেই। প্রয়োজনে এই রাজ্যটিকে জলের ভাগ দেওয়ার প্রশ্নে কোন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ কি আপত্তি করতে পারেন? নিজের রাজ্য দিয়ে নদী বইছে বলে, সেই নদীর জলের উপর প্রশ্নাতীত অধিকার ও কর্তৃত্ব কোন রাজ্য দাবি করতে বা অপরকে সেই জলের ভাগ দিতে আপত্তি করতে পারে কি? একইভাবে নিজের প্রয়োজন কড়ায় গণ্ডায় মিটছে না এই অভিযোগ তুলে নিজের রাজ্যের মধ্যে নদীর প্রবাহ কেউ রুদ্ধ করতেও পারে না। নদীর জলবন্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা এবং তা থেকে মুনাফা লোটা কিংবা সংসদীয় ভোটের রাজনীতিতে সুবিধালাভ করার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে অনৈক্য, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং দুর্দশা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হতে দেওয়া যায় কি? নাকি এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি এমন হওয়া উচিত যার ভিত্তি হল সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষের পানীয় জল এবং জলসেচের প্রয়োজন তথা মানবসভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজন মেটানো।

পাঞ্জাব-হরিয়ানার জলবন্টন সমস্যাটি থেকে যে রূঢ় সত্যটি বেরিয়ে আসে, তা হল, সমস্ত সংসদীয় দলগুলিই সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের দিকটিকে অবহেলা করে পুঁজিপতিরা যাতে জল থেকেও অবাধে মুনাফা লুটতে পারে তার পথ পরিষ্কার করছে, সাথে সাথে তারা জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে যাতে যথার্থ সত্য বুঝে মানুষ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে না পারে।

এই পরিস্থিতিতে সেচ, পান এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জলের যোগান ও বন্টনের সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির। এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা ও সমাজে তা প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব সাধারণ মানুষেরই। যাঁরা এই সমস্যায় প্রকৃতই উদ্বিগ্ন, তাঁদের বিবেচনার জন্য কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা হল ঃ

প্রথমত, একথা বোঝা দরকার যে, নদীজল বন্টন নিয়ে বিবাদে জড়িত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা সহ ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষই পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের ফলে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু থেকেও বঞ্চিত। ফলে জল, বিদ্যুৎ বা অন্য যেকোন বিষয়েই বিরোধ দেখা দিক না কেন, বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ মানুষের ঐক্য-সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে নষ্ট করে সে বিরোধের মীমাংসা করা যায় না। তাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং বুর্জোয়া দলগুলির ভোটসর্বস্ব, বিভেদমূলক, সংকীর্ণ এবং প্ররোচনামূলক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে তাঁরা এসবের শিকার না হন।

দ্বিতীয়ত, জল ছাড়া যেহেতু কোন মানুষের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তাই জলসংক্রান্ত কোন বিবাদের ক্ষেত্রে ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল বা প্রাদেশিকতাকে ভিত্তি করে ঘৃণা, হিংসা, কিংবা শত্রুতার মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হওয়া চলবে না। বরং সৌহার্দ্য এবং আন্তরিকতা বজায় রেখে বিশদ আলোচনা এবং উভয়পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তি করতে হবে।

তৃতীয়ত, বিবদমান রাজ্যগুলির মধ্যে জলবন্টনের জন্য স্বীকৃত সর্বজনীন নীতি, প্রচলিত রীতিনীতি, পরম্পরা এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে। এগুলিই হবে ঐকমত্যে পৌঁছানোর বিতর্ক বা আলোচনার ভিত্তি।

চতুর্থত, কোন একটি নদীর জলবন্টন করার আগে, সামগ্রিক, কার্যকরী এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে জলের অন্যান্য সমস্ত উৎসগুলিকে কাজে লাগাতে হবে এবং খরা-বন্যা, জল জমা ও ভূগর্ভস্থ জলতল নেমে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই যে জলসম্পদ রয়েছে তা পুরোপুরি ও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে, বিবদমান রাজ্যগুলির জনগণকে তাদের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চমত, দুই বা ততোধিক রাজ্য ব্যবহার করতে পারে জলের এমন নতুন উৎস খুঁজে বার করতে এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ষষ্ঠত, সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে বিবদমান রাজ্যগুলির কোনও একটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করতে পারে এবং ন্যায়ের পথ থেকে সরে যেতে না পারে সেজন্য সাধারণ মানুষকেই সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যুৎ এবং জলসম্পদ বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও দরিদ্র চাষীদের কথা মাথায় রেখে এবং খরাপ্রবণ এলাকাগুলির প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে জনমুখী এবং বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় জলনীতি তৈরি করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

সপ্তমত, চাষের জন্য কম দামে এবং দরিদ্র কৃষকদের জন্য বিনামূল্যে খালের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পানীয় জল সরবরাহে যাতে সরকার প্রাধান্য দেয়, তার জন্য জোরালো ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলতে হবে।

অষ্টমত, খালের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কৃষিতে ভর্তুকি, কৃষিজ পণ্য আমদানি বন্ধ করা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকার কর্তৃক কৃষিপণ্য ক্রয়, সকলের জন্য কাজ, ঋণের ফাঁদ থেকে উদ্ধার, কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের স্বার্থবিরুদ্ধ নয়া কৃষিনীতি বাতিলের দাবি তুলতে হবে।

এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষ, বিশেষত পাঞ্জাব ও

সাতের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ

সন্ত্রাস ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাসদ-এর আন্দোলন

২১ আগস্ট বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড হামলার ঘটনার মধ্য দিয়ে ওদেশের পরিস্থিতির যে চেহারা প্রকাশ পেল, তাতে এই মুহূর্তে ওদেশের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান নিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক জনসভার আয়োজন করেছিল। ঐ সভায় সভাপতির বক্তব্যে বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা আওয়ামী লীগের ওপর হলেও সকল গণতান্ত্রিক শক্তির জন্যই তা এক অশুভ সংকেত। বহু স্বৈরতান্ত্রিক বিধিবিধান প্রচলিত থাকলেও দেশে যতটুকু গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে ওই হামলা তাকেও বিপন্ন করে দিয়েছে। ফলে সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির উচিত স্ব স্ব অবস্থান থেকে দেশব্যাপী সংঘটিত বোমা ও গ্রেনেড হামলাগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে সরকারের ওপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করা এবং এ দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ২১ আগস্টের ঘটনায় সারা দেশের মানুষ স্তম্ভিত এবং বিক্ষুব্ধ ছিল। স্বতস্ফূর্তভাবে ২২ ও ২৩ আগস্ট অঘোষিত হরতাল পালিত হয়েছে। সরকারি দলও এ ঘটনাকে তাৎক্ষণিক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অতীতের জের টানতে পারেনি। তাদেরও বলতে হয়েছে, এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, গণতন্ত্রের দুষমণ ইত্যাদি। এমন একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল যাতে অন্ধকারের শক্তি, প্রতিক্রিয়ার শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি সহ সকল দেশি-বিদেশি মদতপ্রাপ্ত চক্রান্তকারী সন্ত্রাসী শক্তিকে দিনের আলোয় দাঁড় করানো যেত, বিচার করা যেত। কিন্তু এবারও অতীতের মত তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিদলীয় পাল্টা-পাল্টির অসুস্থ রাজনীতির আবর্তে পড়ে নানামুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। দিনে ২৫ জন করে খুন হচ্ছে। বোমা আতঙ্কে স্কুল-কলেজ-মসজিদ-মাজার-মন্দির-গীর্জা সহ সর্বত্র বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হচ্ছে। জীবনযাত্রা প্রায় স্থবির হয়ে গেছে। নিরাপদে সভা সমাবেশ মিছিল করার সুযোগ নেই। বিচার ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। আগে বিচারকরা বিব্রত হত, এখন রায় ঘোষণার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক সাথে ১৯ বিচারক নিয়োগ করে উচ্চ আদালতকে বিএনপি'র শাখায় পরিণত করা হচ্ছে। এদিকে শাসকদের ক্রমবর্ধমান প্রশ্রয় পেয়ে ধর্মব্যবসায়ী সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালন চরমে উঠেছে। এদের দাপটে সত্যকথা স্পষ্টভাবে বলে স্বাভাবিক জীবনযাপন দুরূহ হয়ে পড়েছে। আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দিক থেকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিও সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বর্তমান দ্বিদলীয় পাল্টাপাল্টির রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে বামগণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে। এজন্য দেশের সকল বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অপর গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সমঝোতাভিত্তিক দৃঢ় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, আবদুল্লাহ সরকার, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী ও মহানগর সমন্বয়ক ফজলুর রশীদ ফিরোজ। জনসভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

জনসভা থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর গাইবান্দায় কৃষক জনসভা, বিক্ষোভ ও ডি সি কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশ, ১৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে, ১৫ সেপ্টেম্বর ফেনীতে, ১৬ সেপ্টেম্বর সিলেটে, ১৭ সেপ্টেম্বর জয়পুর হাটে, ২৮ সেপ্টেম্বর খুলনায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার মুক্তাঙ্গনে বিরাট জনসভার একাংশ। (ইনসেটে) সভার পর ঢাকার রাজপথে মিছিল

অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে আন্দোলনে ডি ওয়াই ও, ডি এস ও

'রাজ্য জুড়ে বিষবৃক্ষের মত ছড়িয়ে পড়া অনলাইন লটারি সেন্টারগুলিতে গিয়ে দরিদ্র সাধারণ মানুষ বিশেষত যুব সমাজ যেভাবে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। কোনরকম টালবাহানা না করে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে এই জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করা এবং এই জুয়াচক্র ভাঙতে দৃঢ় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে' ১৭ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ ও কমরেড নবেন্দু পাল। তাঁরা বলেন, গোটা দেশে শাসক রাজনৈতিক দলগুলি ও তার নেতা-মন্ত্রীদের নীতিহীনতা ও ব্যাপক দুর্নীতির ফলে যে সামগ্রিক সামাজিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ছে এই লটারি জুয়াও তারই অঙ্গ। এ রাজ্যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার একদিকে অনলাইন লটারি সহ অন্যান্য লটারিগুলি চালানোর অনুমোদন দিয়ে ট্যাক্স আদায় করছে, ঢালাওভাবে মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিচ্ছে, অন্যদিকে তাদেরই শাখা সংগঠনগুলিকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মহড়া দেওয়াচ্ছে। তাঁরা বলেন, রাজ্য সরকারের এ এক নির্লজ্জ দ্বিচারিতা। ডি ওয়াই ও এবং ডি এস ও এই দাবিতে ইতিমধ্যেই আন্দোলনে নেমেছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত এলাকা ভিত্তিক প্রচার চলবে। আগামী ৬ অক্টোবরের মহামিছিলের দাবি সনদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল অনলাইন লটারি নিষিদ্ধি করতে হবে এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এই দাবির ভিত্তিতে রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-যুব মহামিছিলে অংশগ্রহণ করবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন। এরপরেও তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। ৭ - ১২ অক্টোবর থানা এবং ব্লক ভিত্তিক বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ কর্মসূচি নেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন কমরেড সুব্রত গৌড়ী, সুরথ সরকার প্রমুখ ছাত্র-যুব নেতৃবৃন্দ।

মহিলাদের নানা দাবিতে ২৫ আগস্ট মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে এম এস এস-এর উদ্যোগে মহিলা মিছিল

হাড়োয়ার পুলিশ ব্যারাকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মহিলাদের প্রতিবাদ সভা

গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতে হাড়োয়া থানার পুলিশ ব্যারাকে এক মহিলাকে ঐ থানারই পুলিস কনস্টেবল তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষী পুলিশের শাস্তির দাবি জানায়। কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর কলেজ স্ট্রীট মোড়ে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও বহু ছাত্রছাত্রী যুবক, পথচারী মানুষ সংগঠকদের বক্তব্য শোনেন। এ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে যেভাবে দুর্নীতি চলছে এবং নৈতিক অধঃপতন ঘটছে বক্তারা তার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বলেন, পূর্বতন কংগ্রেসের মতই বর্তমান সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যেভাবে দলীয় স্বার্থে পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েছে এবং গণআন্দোলন দমন করতে একের পর এক স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছে, তার পরিণতিতে বর্তমানে পুলিশ-প্রশাসন যা খুশি করার সাহস পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করা যাদের দায়িত্ব, তারাই আজ ভক্ষক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ। বক্তারা প্রশাসনের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন। গণমাধ্যমে, টিভিতে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, সেক্স অ্যান্ড ভায়োলেন্স-এর ছবি দেখানো বন্ধ করার দাবি করেন। সাথে সাথে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যেভাবে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে ও শিক্ষাক্ষেত্রে জীবন শৈলীর নামে যৌন শিক্ষা চালু করতে চলেছে, সমাজজীবনে তার মারাত্মক কুপ্রভাবের কথা বিশ্লেষণ করে ছাত্র-যুব-মহিলা তথা আপামর জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই প্রতিবাদ সভা থেকে আহ্বান জানানো হয় এবং ধর্ষণকারী পুলিশ কনস্টেবলকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি করা করা হয়।

নদীর জলবণ্টন সমস্যা

ছয়ের পাতার পর

হরিয়ানার দরিদ্র-মধ্য চাষী এবং কৃষিশ্রমিকদের চূড়ান্তভাবে সতর্ক হতে হবে যাতে তাঁরা বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষুদ্র, সংকীর্ণতাবাদী, বিভেদকামী ও গদিসর্বস্ব তথা ভোট-ব্যাংক তৈরির নীতির শিকারে পরিণত না হন। নিজেদের মধ্যেকার ঐক্য এবং সৌভ্রাত্রের ঐতিহ্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে এই সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষকে নিজ নিজ রাজ্যে জল ও বিদ্যুৎ সমস্যা সহ জনজীবনের সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সামনে রেখে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে যে সমস্ত দাবিতে জোরালো আওয়াজ তুলতে হবে, সেগুলি হল ঃ—

(১) অবিলম্বে এস ওয়াই এল খাল কাটতে হবে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য দুটি যাতে এই বিষয়ে মীমাংসা-বৈঠকে বসতে রাজি হয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে সেজন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে এবং আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা জলবন্টন সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করতে হবে।

(২) পাঞ্জাব ও হরিয়ানা — উভয় রাজ্যের সরকারকেই নিজের নিজের রাজ্যের জলের উৎসগুলি থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে জলবন্টন করার, এবং জলের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) রাজ্যগুলির মধ্যেকার যাবতীয় বৈষম্য অবিলম্বে দূর করতে হবে।

(৪) নতুন জল ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে।

(৫) হরিয়ানার জন্য কিসাউ বাঁধ প্রকল্পের কথা স্মরণে রেখে কেন্দ্রীয় জল কমিশনের হাতে পড়ে থাকা বকেয়া বহুমুখী প্রকল্পগুলিকে অবিলম্বে মঞ্জুরি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এগুলির জন্য উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

(৬) দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও মধ্যচাষীদের স্বার্থের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে এবং খরাপ্রবণ এলাকার প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে যথার্থ জনমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় জলনীতি তৈরি করতে হবে।

আন্তঃরাজ্য নদী জলবন্টন নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের সমস্যা। ফলে তা সমাধানের জন্য চাই যুক্তিনিষ্ঠা, জ্ঞান, ধৈর্য এবং সর্বোপরি এই সমস্যাটি যে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের পক্ষে একটি ভয়ংকর সমস্যা — তা বুঝতে পারার মতো দৃষ্টিভঙ্গি।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কমরেড সৌরভ বসুর জীবনাবসান

আকস্মিকভাবে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে কমরেড সৌরভ বসুকে আমরা হারালাম। এই মৃত্যুর কোনও পূর্বাভাস ছিল না, ছিল না আশঙ্কার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত। অথচ সেটাই ঘটে গেল। ১৪ সেপ্টেম্বর সকালে এ সংবাদ দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের কাছে ছিল যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। কমরেড সৌরভকে যাঁরা চিনতেন, জানতেন, তাঁর উষ্ণ-মধুর সাহচর্য যাঁরা পেয়েছেন, ঠোঁটের কোণে তাঁর সদা হাজির মৃদু হাসির ছবি যাঁদের মনে গাঁথা হয়ে আছে, তাঁদের কাছে তাঁর এই অকালমৃত্যু যে কী নিদারুণ আঘাত, সেটা বোধহয় কেবল তাঁরাই অনুভব করতে পারেন যাঁরা তাঁর কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন অগ্রজদের স্নেহধন্য 'মিঠাই', সতীর্থদের নিঃস্বার্থ বন্ধু 'মিঠু', আর অনুজদের অত্যন্ত আদরের 'মিঠুদা' — যার কাছে নিঃসংকোচে আব্দার করা যেত, যেকোনও কথা অনায়াসে বলা যেত।

পিতা প্রয়াত কমরেড রবি বসু ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য। তাঁরই সাহচর্যে শৈশবেই সৌরভের মধ্যে একটা মন গড়ে উঠেছিল যার ফলে উন্নত গুণাবলীর প্রতি, মহৎ চরিত্রের প্রতি প্রথম থেকেই তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন। সন্তানকে প্রায় শৈশবেই পিতা পার্টির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, সৌরভ পার্টির আদর্শে জীবনকে পরিচালনা করে একদিন অনেক উন্নত ও বড় চরিত্রের বিপ্লবী হয়ে উঠবে। এই সংগ্রামে সৌরভ নিঃসন্দেহে সফল হতে পেরেছিলেন। নিজের চরিত্রে, আচারে-ব্যবহারে, প্রাত্যহিক জীবনযাপনে সংস্কৃতির সেই উচ্চ সুরটি তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। বিপ্লব, দল ও শ্রেণীর সাথে নিজের স্বার্থকে পরিপূর্ণভাবে বিলীন করে দেওয়ার সংগ্রামে বহুদূর পর্যন্ত তিনি এগিয়েছিলেন — যে মানদণ্ডেই আজকের যুগে একজন বিপ্লবীকে আমরা উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী বলতে পারি। তাই ১৫ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে (১৩ সেপ্টেম্বর থেকে বৈঠক চলছিল) কমরেড সৌরভের বৈপ্লবিক স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড সৌরভকে মরণোত্তর স্টাফ সদস্যের মর্যাদা প্রদান করেছে।

শিশু বয়স থেকেই সৌরভ বসু দলের কেন্দ্রীয় কমিউনে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্নেহে ও শিক্ষায় বড় হয়ে ওঠাই তাঁর চরিত্রে দুর্লভ গুণাবলীর স্ফুরণে সহায়তা করেছিল। ১৯৭৬ সালে মহান নেতার জীবনাবসানের পর কমরেড সৌরভ আমৃত্যু পেয়েছেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য। সৌরভ বাল্যকাল থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন আলোচনাসভা ও স্টাডিক্লাসগুলিতে যোগ দিতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল খুব প্রখর। আলোচিত বিষয়গুলির অর্থ ও তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা ঐ বয়সে সম্ভব না হলেও, সেগুলি এমনভাবে তাঁর মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তীকালে স্মৃতি থেকে বলে দিতে পারতেন, কোন্ ক্লাসে কমরেড শিবদাস ঘোষ কী বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই পথেই তাঁর ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টির বিকাশ হতে শুরু করে ; শিল্প-সাহিত্য চর্চার মন, মার্ক্সীয় ক্লাসিক্স পড়ার আগ্রহ গড়ে ওঠে। তাঁর শিল্পবোধ ছিল খুবই সূক্ষ্ম ও গভীর। তিনি ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। যেকোনও ব্যক্তির পোর্ট্রেট বা প্রোফাইল ফুটিয়ে তুলতেন দ্রুত। কিন্তু নিছক ছবি আঁকিয়ে নন, তিনি ছিলেন প্রকৃত শিল্পী, তাঁর আঁকা ছবিতে ব্যক্তি বা বিষয়ের মূল চরিত্রটি ফুটে উঠত। ২০০০ সালে ওড়িশার সাইক্লোনে বিধ্বস্ত মানুষের বিপন্নতার প্রতীক হিসাবে 'ওড়িশা মায়ের কান্না' নামে যে ছবিটি 'প্রলেটারিয়ান এরা' ও 'গণদাবী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি ছিল সৌরভেরই আঁকা। এছাড়াও পূর্বতন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের ভারত সফরের সময় তিনি একটি সুন্দর রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন। অঙ্কন ক্ষমতার সবটাই তিনি শিখেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের প্রয়াসে, কোনও প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই। তিনি ভাল গানও গাইতে পারতেন, বিশেষত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সম্পর্কে তাঁর একটা ধারণা ছিল।

১৯৭০ দশকের সূচনায় এস ইউ সি আই-এর কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন 'কমসোমল'-এর কর্মী হিসাবেই কমরেড সৌরভের সাংগঠনিক কাজ শুরু হয়েছিল। কালক্রমে তিনি কমসোমলের একজন নেতৃত্বকারী সংগঠকে পরিণত হন। উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির জন্যই তিনি কমসোমল-এর সকল কর্মীর অত্যন্ত প্রিয়জন হতে পেরেছিলেন, তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতিও তাঁর নজর ছিল, দরদী মন নিয়ে তাঁদের সমস্যা সমাধানে তিনি সহায়তা করেছেন। শালীনতা ও সৌজন্যবোধ ছিল তাঁর খুবই গভীর। রুচি-সংস্কৃতির মান তাঁর খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল বলেই কখনও কঠোর সমালোচনার সামনে পড়েও তাঁর মধ্যে কেউ কখনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখেনি।

১৯৮০-র দশকের সূচনায় কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ (বর্তমানে চেন্নাই) শহরে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করার জন্য পাঠায়। মন-প্রাণ দিয়ে তিনি সেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। নিজের সুমিষ্ট রুচিসম্পন্ন ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তিনি ঐ রাজ্যের কমরেডদের মনই শুধু নয়, পার্টি অফিসের পাড়ার সাধারণ মানুষের মনও জয় করেছিলেন। তাদের সাথে তাঁর হৃদয়ের সংযোগ গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরও সৌরভ আপন চরিত্রের প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন। বিপ্লবী চরিত্রের এই গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়েই, ১৯৮৮ সালে পার্টি কংগ্রেসের আগে ১৯৮৭ সালে পার্টির মাদ্রাজ চিঙ্গলপেট জেলা সম্মেলনে কমরেড সৌরভ ঐ জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুতে মাদ্রাজ জেলা অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে স্মরণসভা।

মাদ্রাজে থাকাকালীন তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে তামিল ভাষায় বলা ও লেখার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও, ইংরাজি ও হিন্দি ভাষাতেও তিনি বলতে ও লিখতে পারতেন। ভাষা শেখার আগ্রহ ও আয়ত্ত করার ক্ষমতা তাঁর এতই প্রখর ছিল যে, শুধু ফরাসি ভাষার বই পড়ে ও ঐ ভাষা প্রশিক্ষণ বিষয়ক ক্যাসেট শুনে শুনে তিনি ফরাসী ভাষায় লেখার ও কথোপকথনের ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে এস ইউ সি আই-এর ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শহীদ মিনার ময়দানের জনসভায় ইটালি থেকে আগত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'নিনো পাস্তি' সংগঠনের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড রবার্তো গ্যাব্রিয়েলে ফরাসি ভাষায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তার ইংরাজি তর্জমা করে শুনিয়েছিলেন কমরেড সৌরভ।

১৯৮৯ সালে কমরেড সৌরভ যখন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফেরেন, তখন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী শারীরিকভাবে অসুস্থ। এই সময় থেকেই কমরেড মুখার্জীর শুধু শুশ্রূষাই নয়, কার্যত ব্যক্তিগত সহকারীর (পি এ) গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন কমরেড সৌরভ। ঐ সময় থেকে সাধারণ সম্পাদকের যত বই, প্রবন্ধ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রেরিত বার্তা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, কমরেড মুখার্জীর আলোচনা ও নির্দেশে সবগুলিই তাঁর কলমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কমরেড নীহার মুখার্জীর সাথে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কমরেড সৌরভের চরিত্রের বিকাশে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে, কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই গুরুদায়িত্ব কমরেড সৌরভ আন্তরিক নিষ্ঠায় হাসিমুখে পালন করে গিয়েছেন। কিন্তু এতবড় দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও এবং পড়াশুনা ও চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর জানার পরিধি বিরাট হওয়া সত্ত্বেও সৌরভের আচরণে কোনদিন আত্মম্ভরিতার লেশমাত্র দেখা যায়নি। এটা তাঁর চরিত্রের একটা বিরাট গুণ ছিল।

১৪ সেপ্টেম্বর সকালে সল্টলেক কমিউনে হৃদরোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ কমরেড সৌরভকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় নেতাদের কয়েকজন ও অনেক কমরেড হাসপাতালে ছুটে আসেন। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাঁরা জানান তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য অনেক নেতা ও কর্মী, তাঁর আত্মীয়স্বজন, শুভানুধ্যায়ী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি হাসপাতালে চলে আসেন। আকস্মিক এই শোকে সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। হাসপাতালে উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, তাঁর আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। বেলা ১২টা নাগাদ তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে সল্টলেক কমিউনে, যেখানে তিনি থাকতেন, নিয়ে আসা হয়। সেখানে তখন গভীর শোকস্তব্ধ পরিবেশ। শোকার্ত প্রতিবেশীরাও এসেছেন। একটি ঘরে শায়িত রাখা হয় কমরেড সৌরভকে। সেখানে মাল্যার্পণ করে প্রথমে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ও উপস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা। তারপর একে একে সল্টলেক কমিউনের অন্যান্য কমরেড, শুভানুধ্যায়ী ও প্রতিবেশীরা মালা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে কমরেড সৌরভের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় লেনিন সরণীতে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে, সেখানে তখন রক্তপতাকা অর্ধনমিত। অফিসের সামনের রাস্তায় কর্মীরা সমবেত হয়েছেন কমরেড সৌরভকে শেষ বিদায় জানাতে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক, কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ সেখানে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমসোমল, এ আই এম এস এস, ইউ টি ইউ সি-এল এস, কে কে এম এস, ডি এস ও, ডি ওয়াই ও প্রভৃতি গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কমরেড সৌরভের শোকার্ত আত্মীয় পরিজনরাও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে সামিল হন। তাছাড়াও তাঁর সংস্পর্শে আসা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পার্টি অফিসের সামনে সমবেত হয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড সৌরভের মরদেহ এরপর শেষকৃত্যের জন্য দক্ষিণ কলকাতার শিরিটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে 'কমরেড সৌরভ বসু লাল সেলাম', 'মিঠুদা তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না'।

বহুমুখী গুণসম্পন্ন উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের এই বিপ্লবীর অকালমৃত্যুতে সমাজের ও বিপ্লবী আন্দোলনের যে বিশাল ক্ষতি হল, তা পূরণ করা সহজসাধ্য হবে না।

কমরেড সৌরভ বসু লাল সেলাম

(১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত স্মরণসভার রিপোর্ট আগামী সংখ্যায়)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net